পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ পদ্মানদীর মাঝি ॥

॥ এক ॥

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিন জনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরো দু মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড়ো নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিন জনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমায় বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

ঐ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জের মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এরকম মাছ পড়ে, দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোনো লাভের আশা থাকিবে না। তবে বড়ো মাছের বড়ো ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের না-ও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, 'যদু হে এ এ এ—মাছ কিবা?'

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, 'জবর।'

জবরের পর সে নৌকা হইতে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাহাদের মাছ পড়িতেছে জবর!

ধনঞ্জয় বলে, 'সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।'

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, 'কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।'

কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীরটা আজ তাহার ভালো ছিল না। তাহার স্ত্রী মালা তাহাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তাহার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাহাকে এমনি ভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে যে সে তাহার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন

হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যাহারা পাতিতে পারে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড়ো পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি-দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারও সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরশুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, 'একটু জিরাই গো আজান খুড়া।'

'জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।'

কুবের বলিল, 'উঁহুঁ, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখান জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভালো নাই।'

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোটো হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল-ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

এক হাতে তীরের দিকে কোনাকুনি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।'

কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্য সত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, 'ইঃ, আজ কি জাড় কুবির।'

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারও সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, 'জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।'

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তাহার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোনো কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না এইটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় তাহাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটোবড়ো সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এই আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখদুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, 'একখান গীত ক দেখি কুবির।'

'হ, গীত না তর মাথা।'

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড়ো সহজ গান নয়।

পূবদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তারপর রওনা হইল জাহাজঘাটের দিকে। সেইখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া স্টিমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোনো স্টিমার ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টিমার ভেড়ে গিয়া জেটিতে। কলিকাতা হইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের ও স্টেশনের দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটরবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায়-পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তাহার সংখ্যা নাই।

নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে-স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।

মেছো-নৌকার ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এই ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধহয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটো যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচবারের বেশি।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশো মাছ গোনা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসারি মাছ ও এক পরল করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উঁচুনিচু ও প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, 'কী কন?'

সে রাগ করিয়া বলিল, 'কী কন! কী কই জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।'

'মাছ তো নাই শেতলবাবু।'

'নাই কী রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়া আয় গা, যা। বড়ো দেইখা আনিস।'

কুবের মাথা নাড়িল, 'আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।'

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার তিনগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, 'তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই?'

'তালি খানিক খাঁড়াও শেতলবাবু।'

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারও নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের এক সময় কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ ক'টা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।